Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-II, January 2024, Page No.179-193
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

মহাভারত: বহমানতার সাক্ষী দুই ভ্রাতৃপ্রতিম

মধুরিমা দাস

স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী বি.এড., বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

The stories of the Mahabharata that I was introduced to in my childhood may not have had the epic resonance, but the poetic grandeur that appealed to children could be found in it. Later on, I could not resist the urge to read all the dramas, stories, novels, poems, essays, translations based on the Mahabharata outside of the curriculum-centred studies of the student life. There are written evidential documents that focused on exploring and discussing solely one character or a comparative finding of the intertwined including romantic relationships of the great epic Mahabharata; however, the two characters that remained in shadow of discussion compared to other characters are the author of the epic ***Vyas deva*** *himself and Mahamahim* ***Bhishma*** *(His Majesty Bhishma).*

It is true that the existing literature on the Mahabharata has provided insights and paved the way for thinking for the authors, novelists, dramatists, critic, and intellects of afterwards, but the discussion found regarding the relationship between ***Vyas deva*** *and* ***Bhishma*** *is more of a political discussion. But aside from politics, was there ever any kind of chemistry about them? In that quest, this research has explored the range of relevant essays, dramas, novels, stories, and documents for an in-depth understanding. The two contemporary Baimatreya (foster) brothers -- Gangeya Devabrata (Devabrata- the son of Ganga) and Krishna-dwaipayana are of similar age; One who left family and domestic life for the welfare of family, the other one who became averse to samsara (worldly concerns) but entered the Kuru-Samsara to protect the Kuru family. Early in life, destiny tied them together somewhat inexorably. However, over time, the chemistry of human ties ensnared the two unlike brothers. Finding the chemistry and enchantment of that relationship is the broad objective of this paper.*

Keywords: Mahabharata, Byas, Bhishma, Epic, Childhood, Relationship, Political relationship.

কথামুখ: বাল্যকালেই মহাভারতের যে কাহিনির সঙ্গে পরিচিতি লাভ করেছি তার মধ্যে মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা হয়তো ছিল না ঠিকই, কিন্তু শিশুদের মনভুলানো কাব্যিক মাহাত্ম্যটুকু তার মধ্যে পাওয়া যেতো। পরবর্তীকালে ছাত্রজীবনের পাঠ্যসূচিকেন্দ্রিক পড়াশোনার বাইরে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে মহাভারত কেন্দ্রিক নাটক, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, অনুবাদ যেটুকু যা পেয়েছি, পাঠ করার লোভটুকু সংবরণ

করে উঠতে পারিনি। তবুও সুদক্ষ পাঠক হওয়ার কিছু অপটুতা আছে বলেই সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডার থেকে খুব সামান্য অংশই পড়ে উঠতে পেরেছি। "কিন্তু সত্যিই কি আমরা আশা করতে পারি আজকের দিনের কোনো অপেশাদার পাঠক আস্ত পুরো অখণ্ড মহাভারতটি পড়ে উঠবেন? মূল সংস্কৃতের কথা না তোলাই ভালো। কালিপ্রসন্নর বৃহদাকার তিনহাজার পৃষ্ঠার সম্মুখীন হলেও ত্রস্ত পায়ে পশ্চাদপসারন করবেন না?"[1] সত্যি বলতে গেলে মূল সংস্কৃত মহাভারত ও কালিপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত না পড়ে ওঠার ভারটুকু কাশিরাম দাস কৃত বঙ্গানুবাদ ও রাজশেখর বসু কৃত সারানুবাদ দ্বারা কিয়দংশ লাঘব হয় বইকি। তবে মহাভারতকে কেন্দ্র করে পরবর্তী সময়ের জিজ্ঞাসু লেখকদের অনুসন্ধিৎসা, গবেষণা, আলোচনা, মহাভারত সম্পর্কে নতুন করে ভাবনাচিন্তা পথটিকে মসৃন করে। মহাভারত যখন মহাকাব্যের আখ্যায় ভূষিত এবং সাধারণ মানুষের কাছে কৃষ্ণ স্বয়ং পুরষোত্তম স্বরূপ, ঠিক সেই সময় বিপরীত পথে হেঁটে ছকভাঙা রীতিতে বঙ্কিমচন্দ্র তার 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে 'মহাভারত' এর কৃষ্ণকে উপস্থিত করলেন মানবকুলের শ্রেষ্ঠ মানবরূপে। তারপর বিংশ শতাব্দীতে 'মহাভারত' এর ঘটনা, কাহিনি, চরিত্র নানান লেখকের লেখার মধ্যে দিয়ে নতুন ভাবে সজ্জিত হয়ে পাঠকের দরবারে উপস্থিত হয়েছে।

মহাভারত কাব্য না মহাকাব্য, ইতিহাস না কবির কল্পনা, এই বিতর্কে না গিয়ে ও যেটুকু খুব সহজেই বলা যায় তা হল – মহাভারত কালের সাথে বয়ে আসা নদীর পৃষ্ঠতলের মতো, আকারে বিশাল, ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। *'আমরা কে কি চাই, কোন প্রত্যাশা ও উদ্দেশ্য নিয়ে মহাভারতে পর্যটক হয়েছি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি তারই ওপর নির্ভর করছে।'* [2] একথা বলাই বাহল্য একই পরিবারের দুই ধারার মধ্যবর্তী ভয়ংকর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে বর্ণনা করার দরুন-ই কবি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস তার অসাধারন কাব্যশৈলীকে কাহিনি বর্ণনার মাধ্যমরুপে গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাভারত সম্পর্কে যে অনুমান ব্যাক্ত করেছেন তা গ্রহণ যোগ্য অবশ্যই:

'আর্যসমাজে যত কিছু জনশ্রুতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকে তিনি (ব্যাস) এক করিলেন...ইহার নাম দিলেন মহাভারত। ...ইহা কোনও ব্যক্তিবিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস।'

মহাভারতে ইতিহাসের ঘটনা, সত্য ঘটনা, তথ্য অংশটুকু কতটা আছে সেই বিতর্ক আমার আলোচনা বহির্ভূত। সাধারণভাবে 'মহাভারত' সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রাচীন ভারতের মহাকাব্যগুলির অন্যতম বলে সমাদৃত। কিন্তু স্বয়ং মহাভারত রচয়িতা কখনোই এই কাব্যকে মহাকাব্য বলে দাবি করেননি। খুব সাবলীল ভাবেই তিনি তার কাব্যকে 'ভারতকাহিনী' নামে অভিহিত করেছেন — 'অনেক কঠোর তপে ব্যাস মহামুনি / রচিল বিচিত্র গ্রন্থ ভারত-কাহিনী।।'[3] পূর্বকালীন ও সমকালীন সময়ের কিছু জনপ্রিয় তথা সাধারন্যে প্রচলিত ঘটনাকে মনুষ্যজনমধ্যে কালজয়ী করে রাখার উদ্দেশ্য নিয়েই বেদব্যাস মহাভারত রচনাই প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তবে মূল মহাভারতের নানান বিষয়বস্তু যেমন – বংশবিবরণী, রাজনীতি, অর্থনীতি- ধর্মনীতি- ন্যায়শাস্ত্রনীতির

[1] 'মহাভারতের কথা', বুদ্ধদেব বসু, পৃ. - ৩১

[2] তদেব , পৃ. - ২৮

[3] কাশিদাসী মহাভারত ', সম্পাদনা - দেবনাথ বন্দোপ্যাধায়, সাহিত্য সংসদ, পৃ. - ২

তত্ত্ব, দেবমাহাত্ম্য ও অলৌকিকতার বাহুল্যতা সাধারণ পাঠক এর কাছে নিতান্তই নিরস বলে বিবেচ্য হতে পারে, কিন্তু শুধুমাত্র মনোরঞ্জন কাব্যকে ভবিষত্যের উদ্দেশ্যে রেখে যাওয়া মহাভারত রচয়িতার অভিলাষ ছিলনা। ব্যাপারটা এইরকম যে— *'কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধটুকু এমনি তে একটা বিরাট ব্যাপার নয় / কিন্তু কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন এই বিষয়টিকে নিয়ে এমন অভাবনীয় বিস্তৃতি দিয়েছেন যে, একটা সমগ্র মানবজাতির মানচিত্র আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে।'* [4]

উপরোক্ত উক্তিকে সম্বল করে বলা যায় – ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম – অধর্ম, মানুষের জীবনে পিঠোপিঠিভাবে অবস্থান করে। অন্যদিকে মানুষের অতীতে গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত ও কৃতকার্য-ই তার ভবিষ্যৎকে গঠন করে। মানুষের নানান বৈচিত্র্যপূর্ণ মানসলোককে প্রকাশ করাই মহাভারত রচয়িতার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। আর সেই উদ্দেশ্যটুকুই তিনি সামান্য গোপন করেছেন নিরস নীতি ও তত্ত্বের আড়ালে। মহাভারতে যে ভারতবর্ষকে বর্ণনা করেছেন রচয়িতা, সেখানে তিনি সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে, ভিন্ন ভাবের মধ্যে, ভিন্ন রুপের মধ্যে। সমাজকৃত ভেদাভেদকে দূরে সরিয়ে রেখে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন একতা স্থাপন করেছেন ন্যায় ধর্মকে সহায়ক করে। সমগ্র মহাভারত কাব্যে ন্যায় -নীতি ও ধর্মের পালক বাহক হিসেবে নানান চরিত্রের উত্থান-পতন ঘটেছে। অন্যভাবে বলতে গেলে বলা কাব্যের প্রতিটি চরিত্রর-ই নিজস্ব ধর্ম – অধর্মের কাহিনি- কাব্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু পুরাতন সাক্ষী চৈতন্যের মতো যারা কুরুবংশ তথা মহাভারতের কাহিনির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার, সেই মহাভারত রচয়িতা স্বয়ং 'কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন' ও 'গাঙ্গেয় দেবব্রত' ই আমার আলোচনার প্রধান স্তম্ভ।

কুরুবংশের রক্ষক: মহাভারতের অধিকাংশ চরিত্রই স্বাভাবিক জটিলতাবিহীন সহজবোধ্য রুপেই চিত্রিত। গরিমা, দৃঢ়তা, পাপ- পূর্ণ, ন্যায়-নীতি বৈশিষ্ট্যসমুহ চরিত্রগুলিকে মহাভারত রচয়িতা পাঠকের সামনে খোলা গ্রন্থের মতন উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু, যে চরিত্রগুলিকে ব্যাসদেব সুখ দুঃখের মানবিক জটিলতার মোড়কে সামান্য আড়াল রেখে প্রকাশ করেছেন, শাস্ত্র ও শস্ত্রগত ভাবে তারাই কুরুবংশের পথ প্রদর্শনকারী ও রক্ষক। একজন স্বয়ং মহাভারত রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, অন্যজন তাঁরই ভ্রাতৃপ্রতিম গাঙ্গেয় দেবব্রত।

মহাভারতের কাহিনির প্রারম্ভেই যে সমকালীন সময়কে আমরা দেখতে পাই সেখানে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, কুরুপাণ্ডব দ্বন্দ্ব, যুবরাজের ভীষণ প্রতিজ্ঞা, কৈবর্ত কন্যার রাজমহিষী হয়ে ওঠার কাহিনি সবই ইতিহাস মাত্র। কুরুবংশের শেষ প্রদীপ জনমেজয় তখন নিভু নিভু, অতিবৃদ্ধ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন তখনও মহাভারতের শুরু থেকে জনমেজয় এর কাল পর্যন্ত *'বিশাল এই সংসারটার মাঝখানে দাড়িয়ে আছেন'* [5] একাকী। পিতৃহত্যার প্রতিশোধের দরুন কৃত সর্পসত্র যজ্ঞে ব্যর্থ হয়ে ক্রোধে জনমেজয় যখন ব্রহ্মহত্যার মতন একটি কাণ্ড করে বসেন তখন ব্যাসদেবকে আমরা সেখানে উপস্থিত হতে দেখেছি। ঠিক যেরকমভাবে কুরুবংশের নানান বিপদে-আপদে ব্যাসদেব সেখানে উপস্থিত হতেন ঠিক সেইভাবেই কুরুবংশের শেষ প্রদীপটির কাছেও তাকে উপস্থিত হতে দেখেছি। ব্যাসদেব জনমেজয়- এর ক্রোধকে শান্ত করেছেন ভারত কাহিনি শুনিয়ে ---

[4] সাহিত্য ও সমালোচনার রুপ রীতি', উজ্জ্বলকুমার মজুমদার,

[5] মহাভারতের ছয় প্রবীণ', নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, পৃ. – ৭

'কৃষ্ণবর্ন চন্দ্রাতপ বান্ধহ উপর/তার তলে ভারত শুনহ নরবর।।' [6] জনমেজয়কে ভারতকাহিনি শ্রবন করতে বলার পিছনে আর যাই হোক ব্যাসদেবের আপন কবিত্ব মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্য নিশ্চয় ছিলনা। আসলে ভালো করে দেখলে বোঝা যাবে ব্যাসদেবের উদ্দ্যেশ্য ছিল জনমেজয়কে অন্তত একবার ন্যায়নীতির পাঠটুকু বুঝিয়ে দেওয়া। জনমেজয় ক্রোধের বশবর্তী হয়ে হঠকারীর মতো যে আচরণ করছে সেই হঠকারিতার পরিণাম কখনোই সুখদায়ক নয় এই সহজ সত্যটা বোঝানোর জন্যই ব্যাসদেব তাঁকে তাঁর পূর্বপুরুষদের ভয়ংকর সমাপ্তির ভারত কাহিনির বিবরণ দিলেন। কুরুবংশের একটু পিছনে তাকালেই পাওয়া যায় মহাভারতের সংসারের সবথেকে বড় মুক্ত পুরুষের কাহিনির সূত্রপাত। নারীরূপী দেবীগঙ্গা দ্বারা সাত - সাতটি সন্তান গঙ্গাবক্ষে নিম্মজনের পর প্রিয়তমা গঙ্গাকে হারাবেন জেনেও সন্তান বিসর্জনের এই স্বেচ্ছাচারিতায় অষ্টমবারে বাধা দিয়েছিলেন শান্তনু। শান্তনুর এই স্নেহ বাৎসল্যতা দেবী গঙ্গা কতটা খুশি হয়েছিলেন তার প্রকাশ না ঘটলেও, কিছু কাল পরে যখন শান্তনুর প্রনয়াসক্তি দেবব্রতর প্রতি তার পুত্র বাৎসল্যতাকে অতিক্রম করেছিল তখন অন্তরালে গঙ্গাদেবীর বক্ষ বিদীর্ণ হয়েছিল নিশ্চয়। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী ভীষ্ম জননী গঙ্গা প্রসঙ্গে বলেছেন:

'বাস্তবে নাশ করে কারা? সেই বিলাসিনী রমণীরাই,যারা ভার্যা মতো ব্যবহার করেন, কিন্তু ভাষা নন। সত্যি কথা বলতে কী, মহাত্মা ভীষ্মদেব যে অজ্ঞাতপরিচয় রমনীর গর্ভে জন্মাবেন, তাঁকে অসামান্য গৌরব প্রমান করার জন্যই গঙ্গা নাম্নী এক রমণীকে যেমন অষ্টবসুর জননী হতে হয়েছে, তেমনই অষ্টবসুর উপাখ্যানের জননী হতে হয়েছে।' [7]

উপরোক্ত বক্তব্যকে স্মরণে রেখেই বলা যায় যে- যদি গঙ্গা কোনো বিলাসিনী রমণীই হয় এবং তারা সন্তান নাশ করেই থাকে তাহলেও গঙ্গা দেবব্রতর বিদ্যাশিক্ষা, অস্ত্রশিক্ষা এবং অন্যান্য শিক্ষার ক্ষেত্রেও সমস্ত প্রকার যত্ন গ্রহণ করেছিলেন। দেবব্রতর প্রতি মায়া-মমতায় গঙ্গার মধ্যে এক সাধারণ রমণীর মাতৃস্বভাবই ফুটে উঠেছিল। গঙ্গা পুত্র দেবব্রতকে শান্তনুর কাছে প্রত্যার্পন করেছিলেন।

যোগ্য সন্তানকে কাছে পেয়ে স্নেহে ও বাৎসল্যতায় শান্তনু দেবব্রতকে কুরুরাজ্যের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। মায়ের পর দেবব্রতর কাছে আপনজন বলতে ছিল পিতা। পিতার অসীম ভালোবাসার প্রতিদানে কুরুরাজ্যের সমস্ত হিতাহিতের দায়ভার আপন স্কন্ধে তুলে নিয়ে শান্তনুকে নিশ্চিন্তিতা দিয়েছিলেন দেবব্রত। কিন্তু মহারাজ শান্তনু যখন পৌঢ়ত্বের কোঠায় পুনরায় প্রণয়াসক্ত হলেন তখন কিন্তু পুত্রের প্রতি পিতার বাৎস্যলতার থেকেও তাঁর কাছে তীব্র হয়ে উঠেছে প্রণয়াসক্তি। বিবাহযোগ্য পুত্রের সম্মুখে নিজ-বিবাহের স্বপক্ষে যে যুক্তি সাজিয়েছিলেন শান্তনু, তা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়— *'এক পুত্র পুত্র নহে বংশের কারণ / এই হেতু চিন্তা মোর হয় নিরবধি।'* [8] শান্তনু সেদিন বলেছিলেন দেবব্রত তাঁর একমাত্র পুত্র, আর মনীষীরা বলেন একপুত্র না থাকার মতোই। যুদ্ধবিগ্রহের দরুন যদি তাঁর প্রাণসংশয় ঘটে তাহলে শান্তনুকে অগ্নিপ্রদানের জন্য কোনো সন্তান থাকবেনা। শান্তনু জানতেন দেবব্রত পরশুরামের কাছে অস্ত্রশিক্ষা গ্রহণ

[6] কাশীদাসী মহাভারত', সম্পাদনা- দেবনাথ বন্দ্যেপ্যাধায়, সাহিত্য সংসদ, পৃ.—৪৫

[7] মহাভারতের ছয় প্রবীণ' নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, পৃ.—৭৬

[8] কাশীদাসী মহাভারত', সম্পাদনা- দেবনাথ বন্দ্যেপ্যাধায়, পৃ.—৭৭

করেছেন এবং যুদ্ধবিদ্যায় ত্রিভুবনে অপরাজেয়; তবুও তিনি তাঁর এই নগন্য যুক্তিগুলোকে স্বপক্ষে ব্যবহার করেছিলেন। *'কিন্তু এই পুত্র ভাবনার সঙ্গে তিনি তাঁর কামনার বিষয়টিও যে নিপুণভাবে মিশিয়ে দিচ্ছেন তা তাঁর বক্তব্য থেকেই বেশ বোঝা যায়।'* [9] নিজের বিবাহের বয়সে পিতৃদায়িত্ব পালন করে পিতা শান্তনুর বিবাহ দিতেও পিছুপা হননি দেবব্রত। লক্ষণীয় বিষয় এই যে সেই বিবাহ-ই তাঁর জীবনের অবশিষ্ট সমগ্র ভাগ্যকে নির্ধারণ করেছে। কৈবর্ত রাজা সত্যবতীর সাথে শান্তনুর বিবাহের ক্ষেত্রে শর্ত রেখেছিলেন সত্যবতীর পুত্রকেই সিংহাসনের অধিকারী করতে হবে এবং কখনো ভীষ্ম ও ভীষ্মের পুত্র যেন সেই সিংহাসনের অধিকার না চায়। ভীষ্ম প্রত্যুত্তরে প্রতিজ্ঞা করেছেন তিনি কোনদিনও সিংহাসনের বা রাজা হওয়ার দাবি করবেন না এবং আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করবেন। এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা করার সময় অন্তর থেকে দেবব্রত কতটা ভেঙ্গেচুড়ে গেছিলেন সেই মনের খোঁজ মহাভারত রচয়িতা ব্যক্ত করেননি। মুলত যৌবন কালকে ভোগের আর বার্ধক্যকে ত্যাগের কাল বলেই আমরা বিবেচিত করি। কিন্তু যৌবন বয়সে স্বেচ্ছায় পিতৃবাসনায় আত্মবলিদানের নিদর্শনে কুরুবংশের পূর্বনন্দন পুরুকেও অতিক্রম করেছেন দেবব্রত। *'মহাকাব্যের বিশাল পরিসরে যখন এমন অভাবনীয় বিরাট ঘটনা ঘটে, পুত্র হয়ে যখন পিতার সুখের জন্য আত্মবলিদানের কীর্তি স্থাপিত হয় তখন আকাশ থেকে দেবতার আশীর্বাদ ঝরে পড়ে পুস্পবৃষ্টি হয়ে, অপ্সরা গন্ধর্বরা এমন দৃষ্টান্তে নৃত্য করেন, কিন্নর-কিন্নরীরা তাঁর যশোগান করেন। দেবতারা আকাশবাণী করে বলেন—এমন ভীষণ প্রতিজ্ঞা যাঁর মুখে শোনা যায় তাঁর নাম হল ভীষ্ম।'* [10] পিতা শান্তনু পুত্র ভীষ্মের চরম আত্মত্যাগের পুরস্কার স্বরূপ ইচ্ছামৃত্যুর বরদান দেন। যে পুত্রের মৃত্যু আশঙ্কা করে সামান্য পূর্বেই শান্তনু বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন সেই পুত্রকেই তিনি বিবাহের পর ইচ্ছামৃত্যুর বর দিলেন। পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে স্বভাবতই, ইচ্ছামৃত্যুর বরদান শান্তনু ভীষ্মকে পূর্বেই দিলেন না কেন? লক্ষণীয় এই যে শান্তনু যদি ভীষ্ম কে পুর্বেই ইচ্ছামৃত্যুর বরদান করতেন তাহলে শান্তনু ও সত্যবতীর বিবাহ হত না। আর সেই বিবাহ সম্পন্ন না হলে গঙ্গা তীরবর্তী সভ্যতার সাথে যমুনা তীরবর্তী সভ্যতা ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্কে একাত্ম হতে পারতনা। যমুনা নদী তীরবর্তী দ্বীপে জন্মগ্রহণকারী সত্যবতী ও পরাশর পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস ও গঙ্গা শান্তনুর পুত্র গাঙ্গেয় দেবব্রতকে এরপর থেকে কুরুবংশের নানান নৈতিক সংকট ও জয় পরাজয়ে ত্রাতা ও রক্ষকের ভূমিকায় লক্ষ্য করা যাবে। বিবাহের পর দুই শিশু সন্তানকে রেখে শান্তনুর মৃত্যু হলে ভীষ্ম সন্তানসম ভাই দুটিকে পালন করেছেন পিতার মতন। মহাকালের পরিহাস; সেই ভাই দুটিও কুরুবংশের কোনো উত্তরাধিকার না রেখেই ছুটি নিলেন। কিন্তু যার মৃত্যু আশঙ্কা করে শান্তনু এই সন্তান দুটির জন্ম দিয়েছিলেন সেই ভীষ্ম দিব্যি বেঁচে রইলেন, চোখের সামনে সিংহাসন ও বংশকে উত্তরাধিকারহীন হতে দেখলেন।

বেদের শাস্ত্র মতে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ক্ষেত্রজ সন্তানধারণ করার ক্ষেত্রে সম্মতি ছিল।

'ক্ষেত্রজ পুত্র সম্বন্ধে যে নিয়ম করা হইয়াছিল তাহাতে দেখা যায়। ক্ষেত্রজ সব সময়েই পানি গ্রহীতার পুত্র, উৎপাদকের নহে।' [11] সত্যবতী অনুরোধ করেছিলেন ভীষ্মকে তার ভ্রাতৃবধূদের ক্ষেত্রজ সন্তানের পিতা হবার জন্য, কিন্তু ভীষ্ম তার কঠোর সত্যে অবিচল থেকেছেন—*'ত্যাজিবারে পারয়ে এসব কদাচন/ তবু সত্য*

[9] মহাভারতের ছয় প্রবীণ' নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, পৃ.—৮২

[10] তদেব' পৃ.—৮৪

[11] মহাভারতের সমাজ' , শ্রী সুখময় ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ, পৃ.-

নাহি ত্যাজে গঙ্গার নন্দন।' [12] তিনি সত্য থেকে বিচ্যুত হননি বলেই মহাভারত রচয়িতা *'দ্বৈপায়ন ব্যাস কে প্রবেশ করতে হল ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান এক রাজতন্ত্রের শরীরে।'* [13]

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, ঋষি পুরুষ, সংসারত্যাগী; সংসারে না থেকেও বিরাট কুরুবংশের ভবিষ্যতকে তিনিই জন্ম দিয়েছেন। তিন পুত্রের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু কে তিনি বিচিত্রবীর্যের সন্তান বলে সম্বোধন করলেও বিদুরের মধ্যে ব্যাস হয়তো নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলেন। শূদ্রা রমণীর গর্ভে তাঁর ব্রাহ্মণ সন্তান। সমাজে তাদেরকে সম্মান দেওয়া হত না 'পারসব' বলে। কিন্তু বেদব্যাস আপন জ্ঞানে ও বিদ্যায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বিদুরকেও তাই তিনি মহাজ্ঞানী হবার আশীর্বাদ দিয়েছেন। সমগ্র মহাভারত জুড়েই দেখা যায় বেদ এর সমাজবিধানকে স্বীকার করে বেদব্যাস শূদ্র ও রমণীদের প্রতি স্থানে স্থানে পক্ষপাতিত্ব করেছেন। শূদ্রা রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলেই হয়তো শূদ্র রমণীর গর্ভের সন্তান বিদুরের মধ্যেই তিনি আত্মঅনুসন্ধান করেছেন। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী ব্যাসের সন্তান জন্মের প্রসঙ্গে বলেছেন–

'প্রসিদ্ধ ভরতবংশের ঋষি ব্যাসের মাধ্যমে যেভাবে বংশধারা সৃষ্টি হল তাতে ভরতবংশের প্রধান উত্তরাধিকারীর যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা লাভ করলেন ব্যাস।' [14]

অর্থাৎ লক্ষ্য করা যায়— ক্ষেত্রজ সন্তানের ক্ষেত্রে উৎপাদকের সঙ্গে পুত্রের কোনো আত্মিকতা থাকত না, পুত্র তাঁর আপন ক্ষেত্র পিতার নামেই পরিচিত হত। কিন্তু মহাভারতে দেখা যায় ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর বিচিত্রবীর্যের পাশাপাশি ব্যাসের পুত্র বলেও চিহ্নিত হয়েছেন। সত্যবতী ব্যাসকে আহ্বান করার পূর্বে ব্যাস তাঁর আপন আশ্রমেই ছিলেন। পিতা পরাশর ব্যাসকে বলেছিলেন যখনই মাতা সত্যবতী ব্যাসকে স্মরণ করবেন তখনই যেন ব্যাস সেখানে উপস্থিত হন। নিয়ম অনুযায়ী পুত্র উৎপাদনের পরবর্তীতে ব্যাসদেব তাঁর আশ্রমেই ফিরে যেতে পারতেন কুরুবংশের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখে। কিন্তু আমরা দেখতে পাই পুনঃ পুনঃ কাহিনির অগ্রসরের সাথে সাথে ব্যাসদেব-ও কুরুবংশের সাথে জড়িয়ে পড়ছেন, একাত্ম হয়েছেন, পিতারুপে পিতামহরূপে তাদেরকে স্নেহ ও মানসিক আশ্রয় দিয়েছেন। কুরুবংশের বীজ বপন করেই ব্যাসদেব কুরুবংশ থেকে বিস্মৃত হননি। অন্যদিকে কুরুবংশের যোগ্যতম সন্তান ভীষ্ম তার কঠোর প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য অবিচল থেকেছেন। বংশরক্ষার যে দায়িত্ব পিতার কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন তিনি, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদের পক্ষে মানবিক সমর্থন থাকলেও কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ করে সেই দায়িত্ব পালন করেছেন। বিচিত্রবীর্য ও চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পরবর্তীতে ভীষ্ম (তাঁর জীবিতকালে) আবার ও এক উত্তরাধিকারের মৃত্যু শোক অনুভব করলেন পা আমরা দেখতে পাণ্ডুর মৃত্যুকালে। পাণ্ডুর মৃত্যু হলে ব্যাস জননী সত্যবতীকে সংসার ধর্ম ত্যাগ করার পরামর্শ দেন— *'গৃহ ত্যাজী জননী চলহ তপোবন/সংসার ত্যাজিয়া মাতা তপে দহে মন।'* [15] ব্যাস তাঁর মাতাকে পাপ ও দুরাচারে পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়া কুরুবংশের ক্ষয় দর্শন থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর মাতারই সমবয়সী প্রবীন ভ্রাতাকে ব্যাসদেব সংসারের পরিবেশ থেকে উদ্ধার করেননি।

---

[12] কাশীদাসী মহাভারত' , সম্পাদনা- দেবনাথ বন্দ্যোপ্যাধায়, পৃ—৮২

[13] মহাভারতের ছয় প্রবীণ' নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, পৃ .—১৫

[14] তদেব' পৃ.— ২৩

[15] কাশীদাসী মহাভারত', সম্পাদনা- দেবনাথ বন্দ্যোপ্যাধায়, পৃ.—১০৪

ভীষ্ম স্বয়ং কখনও সংসার তথা কুরুবংশকে ত্যাগ করে আপন মনের শান্তি সন্ধান করেননি। যে বংশকে বংশকুলদের রক্ষা করার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন সেই দায়িত্বকেই আজীবন শিরোধার্য করেছিলেন তিনি। ভীষ্ম ও জানতেন কুরুবংশ লোভ, পাপ, দুরাচারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কুরুবংশের সেই ক্ষয়কে যতটা সম্ভব রোধ করার জন্যই তিনি সংসারে থেকে গেলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও তাঁর মধ্যে আজীবন রাজ্য ও সিংহাসনের প্রতি অনুগত থাকা রাজকর্মচারীকে লক্ষ্য করা যায়। স্নেহবশত পাণ্ডবদের তিনি হত্যা করেননি, কিন্তু বীর যোদ্ধার ন্যায় পাণ্ডবসেনার ছত্রভঙ্গ ও বিনাশ করেছিলেন।

তাঁর ভয়ঙ্কর পরাক্রম দেখে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের নিয়মভঙ্গ করেছিলেন তাকে হত্যা করবেন বলে। ভীষ্ম হয়তো খুশিই হয়েছিলেন। কৃষ্ণ তার কাছে বন্দনার পাত্র।

জীবনের সমস্ত আঘাত অপমানকে জুড়িয়ে, পিতার ইচ্ছামৃত্যুর বরদানকে অস্বীকার করে কৃষ্ণের অস্ত্রাঘাতে প্রাণ সমর্পন করতে চেয়েছিলেন তিনি— '*শীঘ্র এস, কৃষ্ণ,কর আমারে সংহার / তোমার প্রসাদে তরি এ ভব সংসার।*' [16] কাঙ্খিত মৃত্যু অবধি ভীস্মের প্রাপ্ত হয়নি। অর্জুন বিরত করেছেন কৃষ্ণকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ থেকে। স্নেহ ও ন্যায়বশত তাঁর সমর্থন ছিল পাণ্ডবদের প্রতি কারণ বংশের মধ্যে তাকে যথাযোগ্য সম্মান ও উচ্চাসন একমাত্র পাণ্ডবরাই দিয়েছিল। তথাপি কুরুরাজ্য ও বংশরক্ষার খাতিরে তিনি কখনো দুর্যোধনকে ত্যাগ করেননি। বয়স যত বৃদ্ধি পাচ্ছিল তত রাজসভায় ভীষ্মের গুরুত্ব ও মর্যাদা সবই কমে এসেছিল ধীরে ধীরে। কিন্তু সবকিছু সহ্য করে নিরুত্তর থেকেও বংশের সব বিপদে বক্ষে বেঁধে রাখা ঢালের মতো রক্ষা করে গেছেন, কর্তব্য পালন করেছেন; অন্যায়ের প্রতিরোধ ও করেছেন যথাসম্ভব। জীবনের ধাপে ধাপে বহুবার এমন সময় এসেছে যেখানে ভীস্ম তাঁর ইছামৃত্যু বরণ করে সংসারের যন্ত্রনা থেকে পালিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি পালিয়ে যাননি। বহুকাল আগে পিতা শান্তনু তাঁর মৃত্যু ও জীবনের দোহাই দিয়ে বিবাহ করে তাকে যে রাজ্য ও সংসার সুখ থেকে বঞ্চনা করেছিলেন তা ভীষ্মকে আরও পরিণত করে তুলেছিল। কালের নিয়মে মানুষ যতই পরিণত হয় ততই বাইরের আঘাত অপমান তাকে আর স্পর্শ করে না। ভীষ্ম-ও তাই সমস্ত সহ্য করে সংসারে থেকে গেলেন। ধংসের যে বীজ তার পিতা শান্তনু বপন করেছিলেন, তাঁর অন্তিম দশাও তিনি প্রত্যক্ষ করবেন এই অভিমানেই তিনি কুরুবংশের সংসারে শেষ দশা অবধি থেকে গিয়েছিলেন। শরশয্যায় শায়িত থাকার পর ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন— *'রবির উত্তরায়ন হইবে যখন/ জানিহ তখন আমি ত্যজিব জীবন।'* [17] শরাঘাতে যখন ভীষ্ম শয্যা নিলেন তখনও তিনি ইচ্ছামৃত্যু বরণ করতে পারতেন। শরশয্যায় থাকা অবস্থায় পঞ্চাশ দিন তিনি জীবিত ছিলেন। তার উক্তি থেকে মনে হয় তিনি খুব স্বাভাবিক জাগতিক নিয়মেই দেহত্যাগ করেছিলেন, ইচ্ছামৃত্যু তিনি বরণ করেন নি। ইচ্ছামৃত্যু গ্রহণের ইচ্ছে থাকলে তিনি শরশয্যার যন্ত্রণা নিশ্চয় ভোগ করতেন না। ভীষ্ম মহাভারতে সব কিছু অর্জন করেও, না পাওয়া এক বঞ্চিত মানুষ। তাই রচয়িতা বেদব্যাস তাকে কাব্যে যে নৈতিকতা ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই বিশালত্ব আর কোনো চরিত্রে দেখতে পাওয়া যায় না।

[16] কাশীদাসী মহাভারত' পৃ.—৭৫০

[17] তদেব', পৃ.- ৭৬৪

গৃহী ও সন্ন্যাসী: পিতৃসম্ভোগবাসনায় আত্মবলিদানের মহত্ত্বে ভীষ্ম যযাতি-নন্দন পুরুকেও অতিক্রম করেছিলেন। তাঁর চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায়, পিতা শান্তনুর পরবর্তীতে তিনি যদি রাজা হতেন তাহলে ভরত-কুরুর বংশ নিঃসন্দেহে তাঁর নামেও গৌরব অর্জন করত। কিন্তু রাজা না হয়েও তাঁর চরিত্রের যে প্রতিষ্ঠা ও উচ্চতা, মহাভারতের রাজকীয়তার জৌলুসে তা খানিকটা নেপথ্যেই থেকে যায়। কিন্তু গৌরব অর্জনে তাঁর স্থান মহাভারত রচয়িতা ব্যাস ও পুরুষোওম শ্রী কৃষ্ণের পাশেই। অন্যপ্রান্তে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস, যিনি শুধুমাত্র কুরুবংশের নিয়োগ পিতা ও মহাভারত রচয়িতা হয়েই থেকে গেলেন।

মহারাজা শান্তনুর পরবর্তী সময় থেকে ব্যাস ও ভীষ্ম, উভয়েই কুরু রাজ্যের রাজনীতি ও নৈতিকতাকে রক্ষা করেছেন। আশ্চর্যরকম ভাবে রাজবংশের সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে সম্পর্কযুক্ত না হয়েও কুরুবংশের কুলতন্ত্র ও বংশজকে যারা রক্ষা করেছেন তাঁরা হলেন ভীষ্ম ও বেদব্যাস। একপ্রান্তে ব্যাসদেব পিতা পরাশরের অনুসরণকারী হয়ে জ্ঞান ও তপস্যার মধ্য দিয়ে সন্ন্যাসধর্মে ব্রতী হয়েছিলেন; কিন্তু ভরতবংশের সন্তানবীজ বপন করে মানবিক টানে গৃহী হয়ে রইলেন। অন্যপ্রান্তে শস্ত্রবিদ্যায় অপরাজেয় ভীষ্ম যৌবনরাজ্যে অভিসিক্ত হয়েও পিতৃইচ্ছা পূরণের জন্য আজীবন সংসারে থেকে গেলেন। কুরু সংসারে উভয়ের মধ্যেকার যোগাযোগটুকু ঘটাচ্ছেন সত্যবতী।

নিয়োগ প্রথার নিয়মানুসারে সন্তান সবসময় ক্ষেত্র পিতার পরিচয়েই পরিচিত হত। উৎপাদক শুধু ক্ষেত্রে বীজ বপন করতেন। ব্যাসদেব কুরুবংশে বীজবপন করেই সম্পর্কটুকু চুকিয়ে দেননি; জড়িয়ে পড়েছেন বংশের সাথে। তাঁর নিয়োগ পুত্রদের জন্মের পর থেকেই কুরুবংশের নানান আচারদি অনুষ্ঠানে আমরা ব্যাসকে বারংবার উপস্থিত থাকতে দেখেছি। এই উপস্থিতি শুধুমাত্র ঋষিসুলভ আচরণ নয়, তার সাথে সাথে ছিল মানবিক টান। মানসিকভাবে যদি ব্যাস রাজবংশের সাথে জড়িয়ে না পড়তেন তাহলে নানান যজ্ঞ অনুষ্ঠানমূলক আচারাদি বাদে তার উপস্থিতি পাঠক এর দৃষ্টিগোচর হতো না। কিন্তু ব্যাস তাঁর পুত্র – পৌত্রদের দুঃখে, বিপদে, সঙ্কটকালে বারবার উপস্থিত হয়েছেন। পুত্রবধু গান্ধারী যখন প্রসব যন্ত্রণায় কাতর হয়ে মাংসপিণ্ড প্রসব করেছেন তখন ব্যাস সেখানে হয়েছেন শ্বশুরের ভূমিকায়—*'বলে ব্যাস মুনি/ শুন সুবদনি/ মোর বাক্য অন্য নয়// দুঃখ পরিহার/ মোর বাক্য ধর/ হইবে শত তনয়।'* [18] বেদব্যাস গান্ধারীর কাছে কোনো শাস্ত্র জানা ঋষি হয়ে আসেননি। ঋষি হয়ে এলে তার বাচন- ভঙ্গিমায় সান্ত্বনা ও বাৎস্যলতা থাকত না। ব্যাসকে সাধারণ পাঠক সন্ন্যাসী ও কবি পরিচয়েই জ্ঞাত হয়। তবে তিনি পিতা পরাশর ও পুত্র শুকদেবের মত নির্মোহ, আসক্তিহীন ছিলেন না বলেই তাঁরই বীজী সন্তান ও পুত্রবধু যখন সন্তান ধারণের পরবর্তী সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে তখনই তিনি হস্তিনাপুরের রাজগৃহে ছুটে এসেছেন দুশ্চিন্তায়। অনুমান করা যায় ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডু-বিদুরের জন্মের পর থেকেই তিনি রাজবাড়ির কাছাকাছি আশ্রমগুলিতেই দিনযাপন করতেন। গান্ধারীর প্রসবের খবরে হস্তিনাপুরে এসে একদিকে তিনি গান্ধারীকে মাংসপিণ্ড থেকে সন্তানসৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণনা করেছেন অন্যদিকে তেমনই গান্ধারীর অসহিষ্ণুতাকে শান্ত করেছেন। চরম সংকটের সময়ে জ্ঞানী শ্বশুরকে কাছে পেয়ে গান্ধারীও পরম নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন বলেই অনুমান করা যেতে পারে।

[18] কাশীদাসী মহাভারত', সম্পাদনা- দেবনাথ বন্দ্যেপ্যাধায়, পৃ.—৯১

'তিনি বারবার ফিরে আসেন সেই রাজগৃহের মহলে যেখানে তাঁর পুত্রেরা আছেন। অদ্ভুত তাঁর এই মায়া, এই মমতাবোধ।' [19] গান্ধারীকে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দিয়ে ব্যাসকে একবারের জন্য হিমালয়বাসী হতে দেখা যায়— 'এত বলি ঋষি/ হিমালয়বাসী/গেল হিমালয়ে চলে।' [20] সাময়িকভাবে মনে হতেই পারে ব্যাসদেব হয়তো সংসারের মায়া ত্যাগ করে পুনরায় সন্ন্যাস জীবনে প্রত্যার্পন করলেন। কিন্তু পাণ্ডুর মৃত্যুর খবর পেয়েই আবার তিনি ফিরে এসেছেন হস্তিনাপুরের রাজবাড়িতে। মাতা সত্যবতীকে গৃহাশ্রম থেকে মুক্ত করেছেন। পুত্রবধু কুন্তী ও পাণ্ডব পৌত্রগণ যখন জতুগৃহের অগ্নিসংযোগ থেকে রক্ষা পেয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তখন সেখানে ব্যাস উপস্থিত হয়েছেন। তিনি জানেন তাঁরই অপরপক্ষের পৌত্রদের কারণে পাণ্ডবপক্ষের এহেন দুর্দশা। কিন্তু তিনি এ-ও জানেন জীবন মাত্রই সুখ-দুঃখ, শুভ -অশুভের সংমিশ্রণ। মহাকালের নিয়মে মনুষ্য জীবনে সবই ভোগ করতে হয়। তাই তিনি দুর্যোধন – ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পাণ্ডব পক্ষের হয়ে কোনো বিধান বা আদেশ দেননি। বুড়ো ঠাকুরদাদার মত পঞ্চপাণ্ডবকে মানসিক সঙ্কট থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। ভাবখানা এইরকম- আমি তোমাদের সঙ্গেই আছি, আশঙ্কার কিছু নেই। কুন্তীকে তিনি আশ্বস্ত করেছেন—'দুঃখ না ভাবিহ বধু স্থির কর মন/ অচিরে হইবে তব দুঃখ বিমোচন।' [21] এই আশীষ বচনের মধ্য দিয়েই ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দে তাঁর পক্ষপাতিত্বটুকু বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তা বলে তিনি কখনোই ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনদের ত্যাগ করেননি। তাদের নানান বিয়োগে তিনি পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন পিতার মতন, দুঃখ ভাগ করে নিয়েছেন বন্ধুর মতন। সংসারমোহ ত্যাগ করা শুষ্ক মননের কোন ঋষির পক্ষে এভাবে সংসারে জড়িয়ে পড়া সম্ভব নয়। তিনি সরাসরি সংসারধর্মে প্রবেশ করেননি ঠিকই, কিন্তু মানবিক সত্ত্বায় তিনি কুরুসংসারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। ভীষণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বেই আমরা ব্যাসকে দেখতে পাই ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পরামর্শ প্রদান করতে—*'ব্যাসদেব বলে, শুন ওহে মহাশয়/ কুরুকুল ক্ষয় হবে, জানিহ- নিশ্চয়।'* [22] তাঁর বপন করা বীজ থেকে কুরুবংশের বৃক্ষ প্রস্ফুটিত হয়েছিল তারই অংশ আজ নিজেদের প্রাণ সংশয়ের জন্য যুদ্ধমুখী হয়ে উঠবে, এই পরিস্থিতি তাকে অন্তরে বিদীর্ণ করেছিল বইকি। তবুও মহাকবি কালের গতিকে কখনো রোধ করেননি বা যুদ্ধ থামিয়ে দিয়ে রোধ করার প্রচেষ্টাও করেননি। ধৃতরাষ্ট্র তার পরামর্শ গ্রহণ করে যুদ্ধ থেকে বিরত হয়নি বলে ঋষি ব্যাস ক্রোধান্বিত হয়ে পুত্রকে ত্যাগ করেননি। ঋষিজনোচিত কাঠিন্য কখনো তাঁর চরিত্রে লক্ষ্য করা যায় না। দুর্যোধনের মৃত্যু ঘটলে শোকাকুল দৃষ্টিহীন পুত্রকে সান্ত্বনা দিতে ব্যাস উপস্থিত হয়েছেন তাঁর কাছে। চরম পিতৃস্নেহ ও সন্তান বাৎস্যলতায় ফুটে ওঠে এইভাবে। কারণ ন্যূনতম মানবিক বন্ধনটুকু না থাকলে বারবার তিনি হস্তিনাপুরে পাণ্ডবদের কাছে ফিরে আসতেন না।

তিন বীজি সন্তানের মধ্যে বিদুরের মধ্যেই আপন রূপটিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন মহাভারত রচয়িতা। অজ্ঞাতশীল শূদ্রা রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করা তাঁর সন্তান বিদুর *'তাঁর জননীর রক্তের উত্তরাধীকার, তিনি মাতৃঋণ পরিশোধ করেছেন ঋষিজনোচিত করুনাই জাতিবর্ণের উর্ধ্বে স্থিত হয়ে।'* [23] তিন সন্তানের মধ্যে

[19] মহাভারতের ছয় প্রবীণ', নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, পৃ. - ৯১
[20] কাশীদাসী মহাভারত', সম্পাদনা- দেবনাথ বন্দ্যোপ্যাধায় পৃ.--৯২
[21] কাশীদাসী মহাভারত', সম্পাদনা- দেবনাথ বন্দ্যোপ্যাধায় পৃ.—১৩৮
[22] তদেব' পৃ.—৭০৪
[23] মহাভারতের ছয় প্রবীণ' নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, পৃ.—২৩

বিদুরের জন্মের পরেই ব্যাসকে আমরা অধিক সন্তুষ্টি লাভ করতে দেখেছি। সমগ্র কাব্য জুড়ে এই পুত্রটিকে তিনি জনসমাজের প্রতিনিধি রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেই পুত্র যখন আশ্রমিক পর্বে দেহত্যাগ করে, তখন ব্যাস সেখানে উপস্থিত হয়েছেন বিচলিতহীন, শান্ত, নির্লিপ্তভাবে। জীবনে জন্ম-মৃত্যু মহাকালের প্রক্রিয়া মাত্র; এই স্বাভাবিক সত্যটি তিনি তাঁর ঋষি জীবনে উপলব্ধি ও গ্রহণ করেছিলেন বলেই স্নেহপরায়ণ ঋষি বিদুরের পরলোকগমনকে ঋষিজনোচিত মননে গ্রহণ করতে পেরেছেন নির্লিপ্তভাবে। সংসারে যখন প্রিয়জনের মৃত্যু হয় মনে তখন আপনা থেকেই বৈরাগ্যভাবের জন্ম হয়, এই বৈরাগ্যই মানুষকে সংসারের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে সহায়তা করে। বিদুরের মৃত্যুতেই তাঁর সংসার মায়ার সমাপ্তি ঘটতে পারত। কিন্তু বহুকাল পরে তাঁরই উত্তরপুরুষ, কুরুবংশের শেষ সন্তান জনমেজয় যখন ন্যায়-নীতির সীমাকে অতিক্রম করছে তখন পূর্বের মতোই অতিবৃদ্ধ ব্যাসকে আমরা সেখানে উপস্থিত হতে দেখেছি।

বহুকাল পরে আবার তাঁর সুপ্ত বাৎস্যলতার প্রকাশ ঘটে। ব্যাসদেবের রূপটিও ছিল একাধারে গৃহী ও সন্ন্যাসী। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী বলেছেন— *'বেদ উপনিষদের শাস্ত্রীয়জ্ঞানে যাঁর বুদ্ধি পরিনিষ্ঠিত হয়েছে, সেই তপস্যাশান্ত মুনির দৃষ্টিতে মল-চন্দন,দুঃখ-সুখ, জয়-পরাজয় সব একরকমই হওয়া উচিত ছিল এবং সত্যই ব্যাসের কাছে তা একরকমই। কিন্তু ব্যাস যেহেতু কুরুবংশের পুত্রের জন্ম দিয়ে সংসারধর্মের সীমার মধ্যে এসেছেন, অতএব সংসারের ধর্মই তাঁকে স্নেহের পক্ষপাতে লীলায়িত করেছে। ঠিক এখানেই ব্যাস অন্য শুস্ক-রুক্ষ মুনি-ঋষির মতো নির্লিপ্ত নন। তিনি এখানে বড়ই সজীব এবং সেই জন্যই তিনি মহাকাব্যের কবি।'* [24]

সত্যিই তো সমগ্র কুরুবংশের মাঝখানে ন্যায়দণ্ডের মত বিরাজ করেছেন ব্যাস। অবলোকন করেছেন কুরুবংশের বিনাশ বৃক্ষের জন্ম থেকে ধংস পর্যন্ত। ব্যাসদেবের সমসাময়িকেই ভরত কুরুরবংশকে সুপ্রতিষ্ঠি করার স্বার্থে কুরুবংশের যে প্রতিনিধি আত্মনিয়োগ করেন তিনি হলেন ভীষ্ম। অনেক ব্যক্তি মানুষ-ই ভীষ্ম চরিত্রের প্রশংসার পাশাপাশি তাঁর পিতৃপ্রেমকে অতিরিক্ত বলে সমালোচনা করেন। ভাবখানা কতকটা এইরকম - তিনি পিতার জন্য ভীষণ প্রতিজ্ঞায় অবিচল না থাকলে কুরুবংশকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হতনা। শ্রী সুখময় ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন—

'চিবকাবিকোপাখ্যানে পিতা মাতার প্রতি পুত্রের কর্তব্য সম্বন্ধে বিস্তৃত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ঐ উপাখ্যানে বলা হইয়াছে যে, পিতা নিখিল দেবতার সমষ্টি এবং মাতা দেবতা ও মর্ত্যবাসী সর্ব্বভুতের সমষ্টিস্বরূপ। সুতরাং তাহাদের তুষ্টিতেই নিখিলের পরিতৃপ্তি। পিতাই ধর্ম, পিতাই স্বর্গ, পিতাই পরম তপস্যা, পিতা পরিতৃপ্ত হলে সকল দেবতা পরিতৃপ্ত হন।' [25]

উপরোক্ত বক্তব্যটিকে স্মরণে রেখে মহাভারতের কাহিনির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাওয়া যায় – মাতৃবাক্য মেনে নিয়েই গাঙ্গেয় দেবব্রত পিতা শান্তনুর সঙ্গে হস্তিনাপুরের রাজসংসারে প্রবেশ করেন। তারপর থেকে রাজসংসারে তাঁর আপন বলতে একমাত্র পিতাই ছিলেন। শান্তনু জীবনের প্রৌঢ়ত্ব অবধি সময়কাল গঙ্গার বিরহে প্রেমিকের জীবন অতিবাহিত করেছেন। পুত্রকে ফিরে পেয়েই কুরুরাজ্যের ভার অর্পন করার মধ্য দিয়ে শান্তনুর মধ্যে এক পরম নিশ্চিন্ততা লক্ষ্য করেছিলেন ভীষ্ম। তাই পিতা পুনরাই প্রণয়াসক্ত হয়ে

[24] মহাভারতের ছয় প্রবীণ' নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, পৃ.—

[25] ৩১মহাভারতের সমাজ', শ্রী সুখময় ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ, পৃ.- ২২৬-২২৭

অন্তরে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লে ভীষ্ম তাঁর পিতৃইচ্ছা পূরণ করতে নিজের সর্বস্ব সুখ বিসর্জন দিয়েছেন। পুত্র হিসেবে পিতার প্রতি এ তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার তর্পন। শান্তনু নিজের বিবাহের স্বপক্ষে শাস্ত্রবচনের দোহাই দিয়ে ভীষ্মকে তাঁর বিবাহের বাসনা কৌশলে বোঝাতে চেয়েছেন। ভীষ্ম শুধুমাত্র অস্ত্রবিদ্যাতেই নয়, সমস্ত রকম শাস্ত্রজ্ঞানেও পারদর্শী ছিলেন। তাই খুব স্বভাবতই তাঁর বুঝতে অসুবিধা হয়নি একমাত্র পুত্র থাকাকে অপুত্রক সমান গণ্য করা কৌশল ভিন্ন আর কিছু না। তাই সমস্ত কিছুকে বুঝেও পিতার স্বার্থচরিতার্থর দরুন তাঁর যে স্বার্থত্যাগ তা পুত্রধর্ম ছাড়া অন্য কিছু বলে গণ্য হয় না। সুকুমারী ভট্টাচার্য্য ভীষ্ম চরিত্র বিশ্লেষণার্থে বলেছেন:

'ভীষ্ম প্রথম জীবন থেকেই নৈতিক সংঘাতের সম্মুখীন হয়েছিলেন; পিতাকে সুখী করতে নিজের সব সুখ সম্ভাবনা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেন, শ্রেয় এবং প্রেয়ের দ্বন্দ্বে জয়ী হন। পরে সত্যবতীর অনুরোধেও প্রতিজ্ঞাচ্যুত হননি।জীবন তাঁকে বিশেষ কিছুই দেয়নি, ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানদের অভিভাবকের পদটি ছাড়া এবং এখানেই তাঁর ব্যর্থতার সূচনা।' [26]

উপরোক্ত বক্তব্যটিকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণে রেখে বলা যায়- পিতা মাতার কাছ থেকে কুরুবংশ রক্ষ করার যে মহাদায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন শুধুমাত্র তা রক্ষা করার জন্যই তাঁকে এই দুরাবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তিনি রাজা হলে কাহিনির মোড় যে অন্যরকম হত তা নিসন্দেহে স্বীকার করা যায় বইকি। কিন্তু রাজা হতে পারেননি বলে ভরত ও কুরুবংশের প্রতি তাঁর দায়িত্ব কর্তব্যকে অবহেলা করবেন এমন ব্যাক্তিত্ব তার চরিত্রে ফুটে ওঠে না।

এই দায়িত্ব পালনের দরুনই তাকে প্রতিনিয়ত দুর্যোধন-কর্ন প্রভৃতিদের কাছ থেকে কটুবাক্য শুনতে হয়েছে, অন্নগ্রহনের খোঁটাও শুনতে হয়েছে। বংশের স্তম্ভ এই মানুষটিকে দুর্যোধনরা 'আউট-সাইডার' হিসেবেও ট্রিট করেছে। সেই সময়গুলিতে কি তিনি একবারও বলতে পারতেন না; বাড়ির বয়স্ক ও শান্তনুর পুত্র হিসেবে রাজবাড়ির অন্ন ও বৃত্তির উপর তাঁরও সমান অধিকার আছে। কিন্তু তিনি বলেননি, কারণ- সিংহসনের অধিকারী 'রাজা' পদমর্যাদার প্রতি তাঁর সম্মান ও কর্তব্যবোধ ছিল। ভীষ্মের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রতি কোনোদিনও দুর্যোধন কর্ণরা সম্মান জ্ঞাপন না করলেও ভীষ্মকে কোনো কিছুতেই তারা উপেক্ষা করতে পারত না। তারা সকলেই জানত। যে দীর্ঘ সময়, কাল, পরিস্থিতি, অভিজ্ঞতা সমস্ত কিছুকে ভীষ্ম বহন করে চলেছেন তার অবদান অমূল্য। তাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মত সঙ্কটময় অবস্থাতেও ভরসা না থাকা সত্ত্বেও ভীষ্মকেই সেনাপতি রূপে বরণ করেছে দুর্যোধন। সত্যি বলতে ভীষ্ম চরিত্রের বিশালতাকে অতিক্রম করার সামর্থ্য কারোরই ছিলনা। সংসারে থেকেও সমস্ত দায়িত্ব পালন করেও তাঁর জীবনযাপন ছিল মুক্ত ঋষির ন্যায়। কোনো সম্পর্ক বন্ধনে জড়াননি তিনি। স্নেহের পক্ষপাতিত্ব বাৎসল্যতা তাঁর পাণ্ডবদের সাথে ছিল বইকি, তবুও তা ব্যতীত কোনো দ্বিতীয় সম্পর্কবন্ধনে তাকে আবদ্ধ হতে দেখিনা আমরা।

অনেক সমালোচক, গবেষক মনে করেন আজীবন ব্রহ্মচারী থাকলেও ভীষ্মের জীবনের অতীত বসন্তগুলিতে প্রণয়ের ছোঁয়াটুকু ছিল। অনেকেই কাশীরাজ কন্যা অম্বাকে তাঁর প্রণয়প্রার্থী রূপে প্রতিষ্ঠা করতে

[26] 'প্রাচীন ভারতঃ সমাজ ও সাহিত্য' , সুকুমারী ভট্টাচার্য্য, গাঙচিল, (pdf সংগ্রহ), পৃ.--৩০২

চান। তবে মহাভারত কবি এ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা ব্যাক্ত করেননি। স্বয়ংম্বর সভা থেকে অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা-কে হরণ করার পর অম্বার কারণেই শাল্বরাজার সাথে ভীষ্মের সংঘাত সৃষ্টি হয়। অম্বা পরবর্তীতে ভীষ্মের সম্মতি গ্রহণ করেই শাল্বরাজার কাছে ফিরে গেলে তিনি অম্বাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। কারণ, হরণকালের যুদ্ধের সময় অম্বার চোখে ভীষ্মের প্রতি মুগ্ধতা দেখতে পেয়েছিলেন শাল্ব। প্রনয়িনীর চোখের প্রেমের ভাব তো একমাত্র প্রণয়কারীই অনুভব করতে পারে। শাল্বের প্রত্যাখানে অম্বা ভীষ্মের প্রতি প্রতিশোধ পরায়ন হয়ে উঠেছেন তীব্রভাবে। সংকল্প গ্রহন করেছেন ভীষ্মকে হত্যা করার। ভীষ্মের বীরত্বের প্রতি *'অসীম মুগ্ধতাই বিপ্রতীপভাবে এমন চরম প্রতিশোধস্পৃহায় রূপান্তরিত হয়েছে।'* [27] এই সম্বন্ধ সম্পর্কে ব্যাসদেব স্পষ্ট করে কিছু বলেননি, আভাসটুকু দিয়েছেন মাত্র। তাঁর এই আভাস ইঙ্গিতটুকুই জিজ্ঞাসু পাঠকের কৌতুহলী মনকে কল্পনার জোগানটুকু দিয়েছেন। কাব্যের সমস্ত কিছুই পাঠকের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরলে সেখানে আর নতুন করে কল্পনার কোন অবসর থাকেনা। মহাভারত রচয়িতা আপাত- বহির্ভাবটুকুর আভাস দিয়েছেন কাব্যে, অন্তরের অনুসন্ধান টুকু তিনি রসিক পাঠকের উপর অর্পণ করেছেন।

ভগ্নদীর্ণ সংসারের সাক্ষী: মহাভারতের যে চরিত্রগুলি কাব্যের পাশাপাশি দীর্ঘ সময়কালের বিশাল ব্যাপ্তিকে ধারণ করে আছেন তাঁরা হলেন ভীষ্ম, ব্যাসদেব, দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্য। ওদের মধ্যে ভীষ্ম ও ব্যাসদেব কুরুবংশের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত। কিন্ত চরিত্র দুটিকে কখনোই তাদের বিশালত্বের সমান আদর ও সম্মান প্রদান করা হয়নি। ভরতবংশের পরপর চারটি 'জেনারেশন' তথা বংশধারার ভালো-মন্দ, সুখ-দুক্ষ, ন্যায়-অন্যায়, আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন এঁরা। *'একজন সংসারের বাইরে রইলেন মুনিবৃত্তি গ্রহণ করে, অন্যজন সংসারের রইলেন সন্ন্যাসীর মতো'* [28] লক্ষ করার মত বিষয় এই যে ব্যাস ও ভীষ্ম উভয়েই মহাভারতে তাঁদের মাতৃপরিচয় দ্বারা পরিচিত হয়েছেন। আমরা জানি বিবাহের পূর্বে কুমারীর গর্ভে যে পুত্রের উৎপত্তি হয় তাকে কানিন পুত্র বলে। *'জাতপুত্রা কুমারীকে পরে যিনি বিবাহ করতেন কানিনপুত্র তাঁহাকেই পিতা বলিয়া পরিচয় দিত।*[29] কিন্তু ব্যাস তাঁর আপন পিতা পরাশর ও কাননপিতা শান্তনু; কারোর পরিচয়েই পরিচিত হননি। অন্যদিকে শান্তনু দেবব্রতর পিতা হলেও মহাভারতে ভীষ্মকে 'গঙ্গার তনয়' বা 'গঙ্গা-নন্দন' বলেই সম্বোধন করা হয়েছে। আসলে গঙ্গা নিজেই মানবরূপিণী নদীদেবী হিসেবে কাব্যে উঠে এসেছেন। অন্যদিকে সত্যবতীর বিবাহের পূর্বের সময়টুকু যমুনা নদীর তীরেই কেটেছে। তাই গঙ্গা ও সত্যবতী উভয়েই নদীমাতৃ সত্ত্বাকে বহন করেছেন। আর তাঁদের নামে খ্যাত পুত্ররা ভারতবর্ষের এই বৃহৎ নদীমাতৃক সভ্যতাকে পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। নদী যেমন যুগ থেকে যুগে নানা ইতিহাসের সাক্ষী থেকে যায়, ঠিক তেমনি ভীষ্ম ও ব্যাস কুরুবংশের এক দীর্ঘ সময়ের সাক্ষী থেকেছেন। সাধারণ পাঠক ব্যাসদেবকে শুধু মহাভারতের রচয়িতার দৃষ্টিতেই দেখে। তাঁর বৃহৎ মানবিক হৃদয়স্বত্বাটিকে তারা বুঝে উঠতে পারেনা। তিনি শুধু কাব্য রচনা করেননি, কাব্য রচনার পূর্বে ঘটে যাওয়া সমগ্র ইতিহাসের সময়কালকে যাপন করে তার দুঃখ, বেদনা, আনন্দ সব কিছুকেই অন্তরে ধারণ করতে হয়েছে তাকে। 'ভারতকাহিনী' রচনা করে শুধু টুকরো টুকরো ইতিহাস সংগ্রহ করে রাখেননি তিনি। মহাভারতের মধ্য দিয়ে সমাজের উচ্চ-নিম্ন ভেদাভেদকে

[27] মহাভারতের ছয় প্রবীণ' নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, পৃ.—৯৭
[28] মহাভারতের ছয় প্রবীণ', নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীপৃ. - ১৭২
[29] মহাভারতের সমাজ', পৃ.- ৩৪

ভেঙে দিয়ে, মানুষকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। শূদ্র-ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সব মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে তার কাব্যে। তিনি নিজে ছিলেন ব্রাহ্মণ ও শূদ্র সত্তার মিশ্রণ তথা সংকর। ফলত তাঁর মধ্যে যে অসীম উদারতার সৃষ্টি হয়েছিল তা আমরা পরবর্তীকালে দু-একজন মহামানবের মধ্যেই দেখতে পেয়েছি। যেমন ভেদাভেদের নিয়মকে নস্যাৎ ঐক্য প্রচার করেছিলেন কবিতায়, ভক্তিতে, গানে চণ্ডীদাস, চৈতন্য, কবীর প্রমুখ।

বনপর্বে বকরূপী ধর্ম ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথনের মধ্য দিয়েও ব্যাস তাঁর উদার মতবাদকে প্রকাশ করেছেন। বহুঘটনা ও দীর্ঘসময়কালের সাক্ষী না থাকলে এই উদারতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। মহাভারতের মতন কাব্য সৃষ্টি করতে হলে শুধু কবিকল্প থাকলেই হয় না। তার সাথে সাথে মহাকবির হৃদয়ে থাকতে হয় মানুষের হৃদয় বোঝার ক্ষমতা, ভারতবর্ষের 'জনজাতির ইতিহাস', রাজনীতি, ধর্মনীতি,সমাজনীতির জ্ঞান। মহাভারত কাব্যের মধ্যে দিয়ে ব্যাস প্রতিষ্ঠা করে গেছেন মানুষের কীর্তির কথা, শ্রেষ্ঠত্বের কথা, সর্বোপরি মানুষের কথা। ভারতবর্ষের এক বৃহৎ ও মহৎ পরিবার, ভারতবর্ষের এক সমকালীন বৃহৎ সভ্যতাকে, নৈতিক-অনৈতিক জয় পরাজয়ের মোড়কে কাব্য গঠন করে ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে রেখে গেছেন।

এক অতিদীর্ঘ সময় কাল ধরে নানান ঘটনার প্রেক্ষিতে ভীষ্ম চরিত্রও পরিণত ও দৃঢ় হয়ে উঠেছে। সংসারের গম্ভীর পরিস্থিতিই যৌবনকালের প্রারম্ভে তাঁর মধ্যেকার সরসতার বিলুপ্তিকরণ করেছে। তাই তাঁর চরিত্রের সম্পূর্ণটা জুড়ে শুধু গাম্ভীর্য, সংযম ও ধৈর্য বসবাস করে। স্পষ্টবাদীতা, গুণ ও গুণীজনের কদর ভীষ্ম চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যখন কৃষ্ণ রাজনৈতিক সমাজে সর্বজন স্বীকৃত হননি তখনই ভীষ্ম তাঁর গুণের আদর করেছেন। বয়সে ছোট বলে গুণীর সমাদর তাঁর আত্ম মর্যাদায় কোনো আঘাত করেনি। তিনি নির্দ্বিধায় যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন রাজসূয় যজ্ঞে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি কৃষ্ণকে প্রদান করতে— *'কোন রূপে কৃষ্ণ ন্যূন এ সভার মাঝ/কুলে বলে কৃষ্ণতূল্য আছে কোন রাজ।'* [30]

কুরুকুলের প্রতি ভীষ্মের অসীম শ্রদ্ধা ছিল। কুরুবংশের মঙ্গল ও হিতের জন্য তিনি নিজেকে কুরুবংশের দায়িত্বে অর্পণ করেছিলেন। তবে তাঁর স্বার্থত্যাগই তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বর মর্যাদা দান করেছে। যে দীর্ঘকালীন সময়কে ভীষ্ম তাঁর অভিজ্ঞতার দ্বারা ধারণ করেছিলেন সেই অভিজ্ঞতাই এক বিস্তৃত ইতিহাসের সাক্ষী।

শেষকথা: ছোটবেলায় দাদুঠাকুমা গল্পের ছলে বলতেন— 'যা নেই মহাভারতে, তা নেই ভারতে।' প্রচলিত এই প্রবাদ টি মহাভারতের নিজস্ব বিশালতাকেই নির্দেশ করে। এই বিশালতা শুধুমাত্র মানবসভ্যতার ইতিহাস নয়। এই কাব্যের বিশালত্বকে সৃষ্টি করেছে কাব্যে উপস্থিত রাজনিতি-ন্যায়নীতি- ধর্মনীতি তত্ত্ব ভৌগোলিক বিবরণ, ইতিহাসের অংশ, শাস্ত্র জ্ঞান, ও মনস্তত্ব। মহাভারত নিয়ে নানান তর্ক-বিতর্কের অন্ত নেই। সব তর্কের প্রসঙ্গকে বাদ দিলেও মহাভারতে যেটুকু বাকি থাকে তা মনুষ্যজীবন ও সংগ্রামকে মহিমান্বিত করে। তবে মহাভারতে বর্ণিত সমাজকে আমাদের সময়কালের সমাজের সঙ্গে তুলনা করলে চলবে না। কারণ দীর্ঘ সময়ের প্রেক্ষিতে যুগ-সমাজ সবেরই বদল ঘটেছে, তবে মানুষের মনস্তত্ত্বে এখন-ও ন্যায়-নীতি, দ্বন্দ্ব, জয় পরাজয় লক্ষ করা যায়, যা আমরা মহাভারতের সময়েও দেখেছি।

[30] কাশীদাসী মহাভারত', সম্পাদনা- দেবনাথ বন্দ্যোপ্যাধায়, সাহিত্য সংসদ, পৃ.- ২৯৫

মহাভারতের নায়ক-প্রতিনায়ক, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রত্যেকেই তাদের চরিত্রের অবয়বে আপন কর্ম দ্বারা খ্যাত। কেউ কর্তব্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, কেউ কপটতার দ্বারা চরিত্রের নীচতা প্রকাশ করেছে। চরিত্র রুপায়ণের ক্ষেত্রে মানবচরিত্রের অতি নীচ প্রবৃত্তি থেকে সত্যের উপর অটল থেকে দেবত্ব লাভ অবধি, সম্পূর্ণ ব্যক্তি মানুষটিকে প্রকাশ করেছেন রচয়িতা ব্যাস। চরিত্রগুলির অন্তর্নিহিত শুভ-অশুভ, ন্যায়-অন্যায়ের নৈতিক পরাজয়-ই কাহিনিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। আসলে ভালো-মন্দ, দোষ-গুণ মিশিয়েই মানুষ সম্পূর্ণ হয়। ব্যাসদেব তাই সরাসরি মানুষের মনের ঘরে উঁকি দিয়েছেন। মানব চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত, নাটকীয়তা, সরলতা-চক্রান্ত, নিষ্ঠুরতা, করুণা, ক্ষমা, প্রতিহিংসা, মহত্ত্ব, জটিল প্রণয় ব্যাপার সবকিছুকেই কবি ব্যাস টেনে এনেছেন তার কাব্যে।

মহাভারত সাধারণ পাঠকের শুষ্ক মনোরঞ্জনমূলক কাব্য নয়, আবার উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে মাহাত্ম্য প্রচারের হাতিয়ার নয়। অতীতকে, সমকালকে ভবিষ্যতের হাতে সঁপে দিয়ে চিরকালীন রাখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকেই কবি মহাভারত রচনা করেছিলেন। কারণ – মহাভারত রচয়িতা ব্যাসদেব জানতেন মানুষ চিরজীবী নয়। কালের গহ্বরে মানুষ, সভ্যতা, বংশ সবকিছুর বিনাশ ঘটে থেকে যায় সাহিত্য। সাহিত্য দুইকালের মনুষ্যসমাজের মধ্যে যোগসাধনাটুকু ঘটায়। মানুষকে মানুষের কাছে নিয়ে আসে, এক যুগ আরেক যুগের কাছে পৌঁছে যায়। রসিক পাঠকদের কাছে সাহিত্য-ই 'টাইম মেশিনের' বিকল্প রূপে বিবেচিত হয়। তাই ব্যাসদেব জানতেন তিনি না থাকলেও তাঁর সাহিত্য থেকে যাবে আর তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে থেকে যাবে তাঁর সমকালীন সময়-সমাজ-ইতিহাস।

গ্রন্থপঞ্জী:

1) উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, 'সাহিত্য সমালোচনার রুপ-রীতি', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০ ০৭৩, প্রথম প্রকাশ-২০০৩ (১৪০৯), পঞ্চম সংস্করণ-২০১৬ (১৪২৩)।
2) দেবনাথ বন্দ্যোপ্যাধায়, 'কাশীদাসী মহাভারত', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা- ৭০০ ০০৯, প্রথম সংস্করণ- মাঘ ১৩৯৮ ষষ্ঠ মুদ্রণ- ১৪২৫ (২০১৮)।
3) ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'মহাভারতের একশোটি দুর্লভ মুহূর্ত', নিউ এজ পাবলিকেশন, ৬৫ প্যারীদাস রোড, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-১৯৭১।

4) নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, 'মহাভারতের ছয় প্রবীণ', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ- ২০০২ দ্বাদশ মুদ্রণ- জুন ২০১৮।
5) নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, 'মহাভারতের অষ্টাদশী', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ- ২০১৩।
6) প্রতিভা বসু, 'মহাভারতের মহারন্যে', পিডিএফ- www.amarboi.com
7) বানী বসু, 'কালিন্দী', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ , প্রথম প্রকাশ – ২০১৬।
8) বানী বসু, 'ক্ষত্তা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ , প্রথম প্রকাশ – ২০১৭।
9) বুদ্ধদেব বসু, 'মহাভারতের কথা', এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি. , কলকাতা- ৭০০০৭৩।
10) বুদ্ধদেব বসু, 'অনামনী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ , প্রথম প্রকাশ – ১৯৭০, পুনর্মুদ্রণ- ২০১৭।
11) রাজশেখর বসু, 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত', এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি, কলকাতা-৭০০ ০৭৩, প্রথমমুদ্রণ- ১৩৫৬, পঞ্চদশ মুদ্রণ- ১৪২২।
12) শ্রী সুখময় ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ, 'মহাভারতের সমাজ', বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন সমিতি, শান্তিনিকেতন, তৃতীয় মুদ্রণ—১৩৮৯।
13) শ্রী সুখময় ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ, 'মহাভারতের চরিত্রাবলী', এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং (প্রা) লি কলকাতা- ১২, প্রথম প্রকাশ- ১৩৬৪।
14) সব্যসাচী রায় চৌধুরী, 'প্রেক্ষিতঃমহাভারত', আশাদ্বীপ, ১০/২ বি রামনাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯, প্রথম প্রকাশ – জানুয়ারি ২০২০।
15) সুকুমারী ভট্টাচার্য্য, 'প্রাচীন ভারত: সমাজ ও সাহিত্য', গাঙচিল, পিডিএফ - Evergreen Bangla.com.
16) সুনীল গঙ্গোপ্যাধায়, 'আমাদের মহাভারত', পিডি এফ- www.amarboi.com.
17) সুভাষ ভট্টাচার্য্য, 'সংসদ কিশোর বাংলা অভিধান', শিশু সাহিত্য সংসদ, প্রা. লি ৭০০ ০০৯, প্রথম প্রকাশ- ২০০৩।